Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 183 - 189
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

গোরা : জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে

ড. প্রিয়কান্ত নাথ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID: priyokantonath@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Rabindranath, Nationalism, Europe, India, Administrative power, Religion, Independence, Humanism.

Abstract

After independence, questions arise about Indian nationalism. Pandit Jawaharlal Nehru said- 'The fundamental truth is that we have yet to build a united nation.' The ruling class and other political representatives of India also knew that 'Indians are not one nation'. If we turn our eyes directly to Bengal, we see that as in ancient Bengal there were communities or tribes living in different townships, in modern Bengal too there was no lack of factions among Bengalis in terms of language, caste structure, caste etc. According to Niharranjan Roy, even though Bengali sense of homeland and patriotism arose in the 'Pala period' and this was accepted as the basis of Bengali homogeneity, we see that the ethnic discrimination of Bengali became extreme in the 'Sena period'. Which was unbroken for a long time. Researchers have repeatedly drawn our attention to the similarities as well as contrasts with the Bengali, Marathi or Punjabi nations. As a result, the people of India were inspired by nationalism as 'one nation, one life' against British colonialism - we have to stop at this thought.

Imperialism amasses its financial, military, and administrative power mainly through the brokering of the bottom sections of society in the affected countries. This is equally applicable to Bengal and India. And this is where the differences start - ethnic, political, economic, class, religious, social and cultural. Then in manners, principles, the incompetent imitation of the British was taking place. Which is the main obstacle to the development of nationalism. When European civilization gives the highest importance to state interest in nationalism, lying, untruthfulness, deception do not seem shameful. But Rabindranath believed, 'Beyond caste religion there is a superior religion, which is of the Human being'. Several of his works testify to that. He did not want only a geographical India, he wanted a human India. The emotional product of this sense of difference is 'Gora'. In this novel of his, we find

the main object of nationalism in 'bringing together the strange'. Which is the narrative of our main article.

Discussion

'সমস্ত ভারতীয়রা এক জাতি' — গোটা গোটা হরফে ভারতীয় সংবিধান একথা উচ্চারণ করলেও সত্যিই কি তা ছিল - তা কি আছে? - এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে আমাদের ইতিহাসকে আবার পুনর্বিচার করতে হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বেশ কিছুদিন পরও নিখিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজা যিনি জোর করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, সেই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ১৯৫৬-তে বলছেন, 'মৌলিক সত্য হচ্ছে আমাদের এখনও ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলা বাকি আছে।' ভারতের শাসকশ্রেণি ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাও জানতেন যে 'ভারতীয়রা এক জাতি' নন। রুশ লেখক A. M Diakov বলেছিলেন, 'এক জাতিতত্ত্ব ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির শীর্ষস্থানীয়দের... কেন্দ্রমুখিনতার প্রকাশ'।

আমরা যদি এবার সারসরি বাংলার দিকে চোখ ফেরাই, তাহলে দেখা যায় প্রাচীন বাংলায় যেমন বিভিন্ন জনপদে কৌম বা উপজাতিদের বাস ছিল; তেমনি আধুনিক বাংলায়ও ভাষা-জাতিবিন্যাস বর্ণ ইত্যাদি দিক থেকে বাঙালির মধ্যে দল-উপদলের অভাব ছিল না। নীহাররঞ্জন রায়ের মতানুযায়ী পাল যুগে বাঙালির স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ জেগে উঠলেও এবং এটাই বাঙালির একজাতীয়ত্বের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হলেও আমরা দেখি, সেন যুগে এসেই বাঙালির জাতিগত বৈষম্য চরম রূপ লাভ করে। যা দীর্ঘদিন ধরে অটুট ছিল। আর বাঙালি তথা মারাঠি কিংবা পাঞ্জাবি 'জাতি'র সঙ্গে সাদৃশ্যের পাশাপাশি বৈসাদৃশ্যের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গবেষকরা বারবার। ফলে এক জাতি এক প্রাণ হয়ে জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে — এই ভাবনাতেও আমাদেরকে থমকে দাঁড়াতে হয়। রামকৃষ্ণ মুখার্জি 'The Dynamics of Rural Society' নামক গ্রন্থে L. O. Malley-কে উদাহৃত করে বলেছেন, 'সমাজের ওপর বৈপ্লবিক আক্রমণকে রোধ করার দুর্গ প্রাচীর বলে জাতিপ্রথাকে অনেক চিন্তাশীল ভারতীয় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। যাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ঘনশ্যাম দাস বিড়লা ও মহাত্মা গান্ধি। গবেষক সরাসরি বলছেন -

> "যদিও জনগণ বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং এখনও অনেকের মধ্যে সেই বিভ্রান্তি আছে তবুও সত্য হচ্ছে এই যে, সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণিগুলির একটা বড় অংশ ব্রিটিশ শাসন এখানে প্রতিষ্ঠা করতে যেমন সাহায্য করেছিল, তেমনই জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে দমন করতেও পরবর্তীকালে বারবার চেষ্টা করে এসেছে।"[১]

সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত আক্রান্ত দেশের সমাজের ওপরতলার অংশের দালালির মাধ্যমেই তার আর্থিক, সামরিক ও প্রশাসনিক শক্তি সংগ্রহ করে থাকে। বাংলা তথা ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এ কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। আর এখান থেকেই শুরু হয় বিভেদ – জাতিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শ্রেণিগত, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। তখন বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্ত ব্যাপারেই ইংরেজের অক্ষম অনুকরণ ছেয়ে যাচ্ছিল। যা জাতীয়তাবোধের বিকাশের প্রধান অন্তরায়। তবুও ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসনের চরম অত্যাচারের মধ্যেও ভারতীয় সমাজে জাতীয় চেতনার উন্মেষ গড়ে উঠতে থাকে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য থেকে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন চেতনা-ধ্বনি শোনা যেতে শুরু করে। যদিও 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬), 'মহাজন সভা' (১৮৮৪) প্রভৃতি সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে এবং 'জাতীয় দাবি' পেশ করতে শুরু করে; তবুও লক্ষণীয়, দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানই সংগঠিত হতে পারেনি তেমন করে। ফলশ্রুতিতে 'ইলবার্ট বিল' (১৮৮৩) অচিরেই প্রত্যাহৃত হয় (যে বিলে বিচার ব্যবস্থার অসংগতি দূর করে ভারতীয় ও অভারতীয়ের জন্য একই বিচার-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল)। ইতিমধ্যে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলেও অম্বিকাচরণ মজুমদার 'Indian National Evolution' গ্রন্থে বলেছেন, প্রথম অধিবেশনের মূলকথা ছিল এই : 'ইংরেজ রাজের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হইবে এই প্রতিষ্ঠানের মূল কথা'। যদিও এই আনুগত্য শেষপর্যন্ত বজায় থাকেনি, তবুও আমরা দেখি, ১৮৯২ সালে 'ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট' ভারতবর্ষে চালু করা হয় (যে আইনে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় কোনো ভারতীয়ের অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাহ্য করা হয়)। এই সময়

পর্বেই জাতীয়তাবাদী ভাবনা চিন্তায় বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি তৈরি হতে থাকে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ধরনের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে পারেননি।

জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতা যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, তখন মিথ্যাচারণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা লজ্জাজনক বলে মনে হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, 'জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, যা মানব সাধারণের'। তিনি আরও বিশ্বাস করেন,

> "সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতি দ্বারা আবদ্ধ নহে।"[২]

ফলত ইউরোপীয় ভাবনা-চিন্তা সদৃশ জাতীয়তাবাদ যখন এদেশে গৃহীত হতে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারেন না। ফরাসি চিন্তাবিদ রেনাঁ-র 'নেশন' সম্পর্কিত সংকীর্ণ ভাবনাকে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে 'নৈবেদ্য' কিংবা 'কালান্তরে'ও পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের দম্ভের বিরুদ্ধে বারবার তিনি প্রতিবাদ জানান। তিনি অনুভব করেছিলেন, স্বদেশপ্রেমের ধুয়ো দিয়ে সামাজিক স্বার্থকে অবহেলিত করে উগ্র জাতীয়তাবাদের যে ধ্বজা উঠতে চাইছে; দেশের জনগণ এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারছে না। কেননা, সমাজে জাতি-ধর্ম-শ্রেণিগত বিভেদ; সর্বোপরি অর্থনৈতিক ব্যবধান ও অশিক্ষা তাদেরকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করছে। উপরন্তু, জাপান-চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদ নীতিও তাঁকে ব্যথিত করেছিল। 'ভারতী'তে তিনি লিখছেন ওই সময়পর্বে –

> "ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা পাইয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পারি না। ... গবমেন্টকে চেতন করাইতে তাহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর শুভফল হইত।"[৩]

এখানেই পার্থক্য দেশের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী ভাবনাচিন্তাধারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। এখানেই পার্থক্য সুরেন্দ্রনাথ কিংবা দেশবন্ধুর সাথে রবীন্দ্রনাথের। কেননা, রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ভৌগোলিক ভারতবর্ষকে চাননি। তিনি চেয়েছেন মানবিক ভারতবর্ষ, বৃহৎ অর্থে মানব-বিশ্ব। এই পার্থক্যবোধের অনুভবজনিত ফসল 'গোরা' (১৯১০) এবং পরবর্তীতে 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬)। স্বদেশ হিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা কীভাবে করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন আমাদেরকে প্রাগুক্ত দুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। ধর্ম-বিবেক ন্যায়-নীতি-নিষ্ঠা-ঐক্যকে এক সূত্রে বাঁধার ফলে রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশ ধরা দেয় সজীবসত্তা হিসেবে। আর 'বিচিত্রকে এক করে তোলা'র মধ্যেই ন্যাশনালিজমের মূল মন্ত্র নিহিত আছে বলে তিনি অনুভব করেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস অবধি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'গোরা' উপন্যাস। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। আর ১৩১৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রথম খণ্ডের ৪৫-টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ২২টি পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'গোরা'। উপন্যাসের সময়কাল, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'বঙ্গদেশের একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ'। আর অমরেশ দাশ নির্দিষ্ট করে বলছেন 'আনুমানিক ১৮৮১-১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের বাংলা'। কৃষ্ণগোপাল রায় বলছেন –

> "গোরা'র কাহিনি মাত্র সাত মাসের, তারই ভিতর উপস্থাপিত করেছেন তিনি ১৮৭৭-'৭৮ থেকে '৮১-৮২ এই কালপর্বের ঐতিহাসিক সত্য।"[৪]

গোরা ততদিনে কলেজের সব পরীক্ষা পাশ করেছে এবং গোরা যখন 'ছাত্রসভার ডিম্ব ভেদ করিয়া বয়স্ক সভায় কাকলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল'; তখন মহিম তাকে 'হরিশ মুখুজ্জে দি সেকেন্ড' বলে কটাক্ষ করত। আর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' খ্যাত হরিশ মুখার্জির সময়কাল হচ্ছে ১৮২৮ - ১৮৬১। ততদিনে গোরা ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে, ততদিনে গোরা ব্রাহ্ম থেকে আবার হিন্দু হয়ে উঠেছে। অবশ্য আমাদের কাছে তথ্যগত সময় এতো গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ঐতিহাসিক টানাপোড়েন। কেননা, মাত্র সাত মাসের সময়-পরিধিতে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠলেও উপন্যাস শেষপর্যন্ত অর্জন করে নেয় এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি। তার ইঙ্গিত আমরা উপন্যাসের ২০-সংখ্যক পরিচ্ছেদেই পাই, যখন গোরা সুচরিতাকে বলে- "আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভালোমন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান।"[৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 183 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর গোরার এই আহ্বান শুনে –

> "চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়া থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।"[৬]

অবশ্য গোরাও এর আগেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে –

> "যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের যাহা-কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।"[৭]

অতএব, অসংখ্য চরিত্র ও নানা ঘটনার ঘনঘটা থাকলেও এই উপন্যাসের মূল লক্ষ্য চিরায়ত ভারতসত্যকে অন্বেষণ করা। ফলত আমাদের চিরাচরিত সামাজিক অনৈক্য, জাতিগত বিভেদ, ধর্মীয় ভেদাভেদ-এর বিরুদ্ধে 'গোরা' উপন্যাস প্রথম থেকেই তুমুল আলোড়ন তোলে। 'হিন্দুহৈতেষী সভা'র সভাপতি গৌরমোহন এবং "তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। তাহার গায়ের রঙটা কিছু উগ্র রকমের সাদা - হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠো যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা। দুই চোখ ছোটো কিছু তীক্ষ্ণ।"[৮]

ফলত আমাদের চিরাচরিত সামাজিক অনৈক্য, জাতিগত বিভেদ, ধর্মীয় ভেদাভেদ-এর বিরুদ্ধে 'গোরা' উপন্যাস প্রথম থেকেই তুমুল আলোড়ন তোলে। হিন্দুহিতৈষী সভা'র সভাপতি গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় (গোরা) যে 'সত্য ভারতবর্ষ', 'পরিপূর্ণ ভারতবর্ষে'-র স্বপ্ন দেখে; তাতে একগুয়েমি আছে, উগ্রতা আছে এবং যে পথে সে তার স্বপ্ন সাকার করার আকাঙ্ক্ষা রাখে - বাস্তবের সঙ্গে ভাবনার জগতের তাতে বিস্তর ফারাক। 'হিন্দু হিতৈষী সভা'র সেক্রেটারি বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় তার 'ছায়েবানুগত মিত্র' সেই বিনয়ের সঙ্গে কথোপকথনে গোরা বলে : 'যা-কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া' (পৃ. ৩৯২)। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ গোরার এই আত্মবিশ্বাসী মন্তব্যের পরপরই আমরা গোরার দাদা ইংরেজি আপিসের কর্মচারী মহিমের মন্তব্যে দেখি, মিছে কথার ঘানি টেনে বড়ো সাহেবের পায়ে 'তেল মালিশ' করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার উপায় অবলম্বন করছে সে।

রবীন্দ্রনাথ দুই ভাইয়ের ভাবনা-চিন্তার এই পরস্পর-বৈপরীত্য তৈরি করেন, কেননা, তিনি জানেন, ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকই দেশকে ভেতর থেকে অনুভব করতে পারে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, শ্রেণিগত, জাতিগত ও ধর্মগত ভেদাভেদকেই তাৎক্ষণিক ভাবে বড় করে দেখে। তাই দেখি, হিন্দুধর্মের ছোঁয়াছুঁয়ির বাড়াবাড়িকে গোরা মনে মনে অগ্রাহ্য করেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সামনে তা-ই সে প্রচণ্ডভাবে মেনে চলে। ফলে বিনয়ের ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী পরেশ বাবুদের বাড়িতে যাতায়াতকে সে মেনে নিতে পারে না (যেমন পারেন না কৃষ্ণদয়ালবাবু গোরার ক্ষেত্রে)। প্রতিপক্ষে যেমন পারে না, ব্রাহ্ম সমাজের সমাজের একনিষ্ঠ সেবক স্কুল-শিক্ষক হারানচন্দ্র নাগ। হিন্দু হোক, ব্রাহ্ম হোক - কোনো সমাজেই এ ধরনের লোকের অভাব নেই। আর এই দলাদলিভুক্ত 'লোক পৃথিবীতে বেশ সহজভাবে চলতে পারেনা - এরা হয় ভান করে, নয় বাড়াবাড়ি করে; মনে করে সত্য দুর্বল, এবং সত্যকে কেবল কৌশল করে কিংবা জোর করে রক্ষা করা যেন কর্তব্যের অঙ্গ' (পৃ. ৪৪৭) এবং বিনয়ও পরবর্তীকালে স্বীকার করবে 'মানুষ যেখানে স্বভাবত স্বাধীন, ধর্মত স্বাধীন, আমাদের সমাজ সেখানে তার খাওয়া শোওয়া-বসাকেও নিতান্ত অর্থহীন বন্ধনে বেঁধেছে' (পৃ. ৫০৯)।

ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবনে যে সংকীর্ণতা বাসা বেঁধেছে এবং তারই ওপর প্রলেপস্বরূপ যে জাতীয়তাবাদকে উপরে তুলে ধরা হয়, রবীন্দ্রনাথ যেন ভারতবর্ষেও তার ছায়া দেখতে পাচ্ছিলেন। সতর্ক করছিলেন তিনি এই বলে –

> "আমরা নিকৃষ্ট আদর্শের আকর্ষণে কপটতা প্রবঞ্চনা ও অসত্যের পথে পা বাড়াইয়াছি কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।"[৯]

আমাদের জাতীয় সাধনার সেই প্রথমপর্বে জাতীয়তাবাদের এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ অনেকেই করার প্রয়াস করেন নি। যদিও 'ধর্ম ও ন্যায়নীতি'কে রবীন্দ্রনাথ এই সময়পর্বে আশ্রয় করছেন, তবে এটাও আমাদের ভুললে চলবে না যে 'ধর্ম'কে এখানে মানব সমাজের কল্যাণের সঙ্গে এক করে দেখার চেষ্টা করছেন। এক করে দেখার চেষ্টা না করা হয় যদি, তাহলে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 183 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।' রবীন্দ্রনাথ বারবার জাতিভেদের-ধর্মভেদের-শ্রেণিভেদের এই প্রকাশ্য বেহায়াপনার প্রতি সতর্ক করে বলছিলেন –

> "যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে। কোন্ সৃজনশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে। ভেদের লক্ষণই তো চারি দিকে...।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণীর প্রতি উপেক্ষা এই সময়েও যেন অভিশাপের মতো ভারতবর্ষকে বারবারই আঘাত করছে। ভারতের সাম্প্রতিক জাতিবিদ্বেষ, ভাষা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ প্রতিমুহূর্তে ভারতের মর্মমূলকে কলুষিত করে তুলছে। রবীন্দ্রনাথের মানস-চিন্তায় এটা ধরা পড়েছিল যে, শুধুমাত্র নিজের ধর্মকেই বড় করে তুলে ধরলে হবে না, শুধুমাত্র ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন হলেই হবে না; দেশের সমস্ত জাতি-ধর্ম-সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মিক আধ্যাত্মিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিলনের ওপর ভিত্তি করেই ভারতের যথার্থ জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বিশ্বাস করতেন- 'ভারতীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রধান ঐতিহ্য মিলনমূলক।' এই ভাবনার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা পাই 'গোরা' উপন্যাসে, যখন কলকাতা থেকে বের হয়ে গোরা গ্রামে যায়। এবং "এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল - সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন — প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত — পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত — তুচ্ছতাকে যে সে কতোই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন — তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ — তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনোমতেই কল্পনা করিতে পারিত না।"[১১] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-যুক্তিতে গোরা এ-ও জানে, 'মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না'। এবং এখান থেকেই গোরার ভারতবর্ষকে দেখা শুরু হয়। সত্যিকারের দেখা। গোরা দেখে, হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ, নীচু জাতির মধ্যে অনৈক্য হীনম্মন্যতাবোধ, হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ এবং ফলত 'পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে' আমরা এ কী ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি' (পৃ. ৪৮)।

কিন্তু চরঘোষপুরের কাণ্ডের পর গোরা জেল থেকে ফিরে এলেও 'জাতিভেদের ভারতবর্ষ, কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, পৌত্তলিকতার ভারতবর্ষ'র স্বপ্নে বিভোর (বিপিনচন্দ্রের 'Study of Hinduism', অরবিন্দের বৈদান্তিক মায়াবাদ-এর প্রভাব পড়েছিল কি!) এবং অবিনাশ-রা উৎসাহী হয় গোরার প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে। বাগ্মী গোরা জানে ভারতবর্ষের লোককে "ঈশ্বর মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন; এরা নানারকম চলে, এদের বিশ্বাস এদের সংস্কার নানারকম; কিন্তু সমস্তেরই ভিত্তিতে একটি মনুষ্যত্ব আছে; সমস্তেরই ভিতর এমন একটি জিনিস আছে যা আমার জিনিস, যা আমার এই ভারতবর্ষের জিনিস; যার প্রতি ঠিক সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা-অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করে একটি আশ্চর্য মহৎসত্তা চোখের ওপরে পড়ে,"[১২] কিন্তু ব্যক্তি গোরা তা অনুভব করতে পারে না। ফলে বিনয়ের সঙ্গে তা বিরোধ বাঁধে।

বিনয় ললিতার সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করতে পারছে 'নিজেদের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের বাইরে আমরা দেশের মেয়েদের যদি দেখতে পেতুম তাহলে আমাদের স্বদেশের সৌন্দর্য এবং সম্পূর্ণতাকে আমরা দেখতুম, দেশের এমন একটি মূর্তি দেখা যেত যার জন্য প্রাণ দেওয়া সহজ হত - অন্তত, তা হলে দেশের মেয়েরা যেন কোথাও নেই এরকম ভুল আমাদের কখনোই ঘটতে পারত না' (পৃ. ৪৪২)। অথচ গোরার ভাবনা ঠিক তার বিপরীত। সে মনে করে 'সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতোই প্রচ্ছন্ন - তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত' (পৃ. ৪৪২)। অথচ গোরা জানে না আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে। অথচ গোরা জানে, কিন্তু মানতে চায় না, "মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, যেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে।"[১৩]

বিনয় যেখানে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে সমাজের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে ললিতাকে আপন করে নিতে পারে, সেখানে গোরা সুচরিতার অস্তিত্বকে মনের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভব করলেও সামাজিক অনুশাসনের দোহাই দিয়ে কেবলই নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। গোরার এই দ্বিধা, গোরার এই দ্বন্দ্ব আবার তাকে ভারতের সজীব সত্তা যেখানে নিহিত, ভারতের আপামোর মানুষের

মিলনক্ষেত্রে তাকে যেতে প্রাণিত করে। সে বুঝতে পারে শহুরে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে সামূহিক ঐক্যের একটা মিলনক্ষেত্র তৈরি হলেও,

> “পল্লীর মধ্যে যেখানে বাহিরের শক্তিসংঘাত তেমন করিয়া কাজ করিতেছে না, সেখানকার নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ... যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না। যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে-ফিরিতে উঠিতে-বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে।”[১৪]

আমাদের মনে হয় এ কথাগুলি গোরা-র নিজের সম্বন্ধেও অনেকখানি সত্যি। গোরা অনুভব করত, ‘আমি তোমাদের, তোমরা আমার’। কিন্তু আপন হতে বের হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর ভিত্তি তৈরি করতে পারছিল না। গোরা জানত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –

> “যে প্রেমে, যে-মিলনে ভারতের সকলেই আহূত, ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন আমরা তাদের কাউকে শত্রু বলে দূরে ফেলতে পারবো না।”[১৫]

কিন্তু এই সংযোগ-সেতু গড়ে উঠতে পারছিল না। এবার প্রায়শ্চিতের পরমক্ষণে গোরা যখন তার বাবা কৃষ্ণদয়ালবাবুর মুখ থেকে শুনল, সে আইরিশ সন্তান; সে ব্যবধানও ঘুচে গেল। পুথিগত বিদ্যার ফলে স্বদেশ-লক্ষ্মীকে সে দেখতে পেয়েছিল সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়; যেখানে দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্র্য, যেখানে কষ্ট আর অপমান - সেখানে। এবার সেই মা-কে যেন অনুভব করতে পারল আপন হৃদয়ে। ফলে একদিন যে হিন্দুয়ানির বর্ণভেদের কঠিন শৃঙ্খলকে মেনে চলত পদে পদে স্পর্ধাভরে; আজ তার ব্রাত্য হবার, পতিত হবার ভয় ঘুচে গেল। সে তাই মানবতার মূর্ত প্রতীক পরেশবাবুকে বলতে পারল –

> “আমি একটি নিষ্কন্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি! আজ এই মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে - আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি — সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে - যেন আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয় — যেন সেই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।”[১৬]

গোরা এবার মেনে নেয়, এই কল্যাণসাধনার পথেই সুচরিতা উপযুক্ত সহযাত্রী। এবং যিনি গোরার চোখের সামনেই একের পর এক উদাহরণ তৈরি করে যাচ্ছিলেন নীরবে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে; সেই আনন্দময়ীকে সে এবার দেখল –

> “যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই — শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।”[১৭]

পু“নশ্চতে এসে এ কথা বলতেই হয়, রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতীয়তাবাদ ছিল সমস্ত ধরনের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে মানুষকে বড় করে দেখা। তিনি মনে করতেন মানবাত্মা বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত। সকল প্রকার সামাজিক অনৈক্য, বিভেদ ও দাসত্বকে তিনি দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। মানবিকতার প্রেক্ষিতে তাঁর এই জাতীয়তাবাদের উপলব্ধি আমাদের দেয় পরিশুদ্ধ মানবতার এক নির্মল বিশ্বাস। তাঁর সেই চিন্তাভাবনার সঠিক অনুধাবনে আমরা পাই এক সংস্কারমুক্ত মানবিকতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথই বর্তমান বিচ্ছিন্নতা এবং স্বদেশ ও বিদেশের স্বার্থসংঘাতের অবসানের অন্যতম পথ-নির্দেশক।

Reference:

১. ঘোষ, সুনীতিকুমার, ‘বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি’, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট কলকাতা-১, প্রথম প্রকাশ - ২০০১, পৃ. ২৮

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘আত্মশক্তি’, ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯,

পৃ. ২০

৩. মজুমদার, নেপাল, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯১৫, পৃ. ৫৭

৪. রায়, কৃষ্ণগোপাল, 'পর্যালোচনায় গোরা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ – ২০১৫, পৃ. ১৯

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খন্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুর্নমুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৪৫৮ - ৪৫৯

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খন্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুর্নমুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৪৫৬

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খন্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ -১৪০৯, পৃ. ৩৯৫

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ -১৪০৯, পৃ. ৩৮৩

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সমূহ', 'রবীন্দ্র রচনাবলী', পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৭৬১

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রাজা প্রজা' 'রবীন্দ্র রচনাবলী', পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৬৭৫

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭ , পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৪৮১

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৫৯৩

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কালান্তর', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৬৩৪

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৬৩৯

১৫. মজুমদার, নেপাল, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', 'প্রথম খণ্ড', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৯৫, পৃ. ৩১৯

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৬৬৩

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, ('গোরা'), বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯, পৃ. ৬৬৫

Bibliography:

'গোরা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯